অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। পরীক্ষার ফি আর সরস্বতী পূজা ।।

পিরোজপুর রেঞ্জের পুলিশের এ্যাডিশনাল আইজি মোশাররফ হোসেন আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু সহকর্মী। জয়দেবপুরে আমরা একসঙ্গে চাকরী করেছি নাটক করেছি – হরেক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে ছিলাম তখন। তো সেই মোশাররফ কিছুদিন আগে হঠাৎ আমাকে ফোন দিয়ে বললো – পারভেজ ভাই কবিতা ভাবীর দাদা লেখক সা'দত আলী আখন্দ -এর (এম আর আখতার মুকুলের বাবা) লেখা "তেরো নম্বরে পাঁচ বছর" বইটা আপনার কাছে আছে কিনা বা বাংলাদেশে কোথায় কার কাছে পাবো যদি বলতেন। বইটা আমার খুব দরকার। এই বইটা আমার পুলিশের চাকরীর প্রথম প্রশিক্ষণে আমাদের পাঠ্য ছিলো। আমি আমার রেঞ্জে পুলিশের একটা বিশেষ প্রশিক্ষণে বইটা ব্যবহার করতে চাই। এবং আমি মনে করি পুলিশের প্রত্যেকটা মানুষের এই বইটা একবার হলেও পড়া উচিত। বইটা আউট অব প্রিন্ট তাই কোথাও পাচ্ছি না। মোশাররফকে বললাম সাগর পাবলিশার্সে খোঁজ করতে না হলে আর পাবার সম্ভাবনা নেই। ওদের সদর দপ্তরের লাইব্রেরীতে চেষ্টা করেও দেখতে বললাম।

লেখক সা'দত আলী আখন্দ ইংরেজ আমলে একজন জাঁদরেল পুলিশ অফিসার ছিলেন। ছাব্বিশ বছর ব্রিটিশের অধীনে আর বাকী পাঁচ বছর তিনি পাকিস্তান সরকারের অধীনে চাকরী করে অবসর নেয়ার পর পনেরো বছর বগুড়া শহরে ওকালতী করেছেন। ১৯২৬ সাল নাগাদ কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশের সদর দপ্তর ১৩ নং লর্ড সিংহ রোডে বদলি হয়ে আসেন। এখনেই দীর্ঘ পাঁচ বছর গোয়েন্দা পুলিশে চাকরীর সময় তিনি অত্যন্ত সন্তর্পণে বাংলার স্বদেশীদের কর্মকান্ড এবং তাদের বিরুদ্ধে গুপ্ত পুলিশের কার্যকলাপ অবলোকন করে যে সব চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তারই ফসল এই স্মৃতিচারণমূলক বই "তেরো নম্বরে পাঁচ বছর"।

সম্প্রতি কুমিল্লায় মূর্তির পদপ্রান্তে পবিত্র কোরাণ শরীফ রাখাকে কেন্দ্র করে সারা দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি যে নির্যাতন বর্বরতা চালানো হয়েছে সে বিষয়গুলো নিয়ে নাস্তার টেবিলে কবিতার সাথে আলাপ করছিলাম। আমরা বলছিলাম আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের বন্ধুস্বজনের কাছে কোন মুখ নিয়ে দাঁড়াবো? কবিতা বললো আমার শান্তিনিকেতনের সহপাঠীদের কাছে কি বলবো? অথচ আমরা সবাই প্রাণের বন্ধু। আমাদের সকল হিন্দু বন্ধুবান্ধবের সাথে ভালবাসায় আন্তরিকতায় ধর্ম কোনদিন দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়নি। এই দূষিত রাজনীতি আমাদের সকল বন্ধন

ভালবাসাকে গ্রাস করে ফেলছে। অথচ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমরা কত আপনার - কত্তোবড় স্বজন।

কবিতা বললো – তোমাকে কোনদিন আমার দাদার মেট্রিক পরীক্ষা দেয়ার গল্পটা বলেছি? বললাম চল্লিশ বছর হতে চললো এখনো তো কত কিছুই বলো নি। ও বলতে থাকলো – আমার দাদা যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবেন তখন পরীক্ষার ফি তখনো দাদার বাবা পাঠাতে পারেন নি। ফি জমা দেবার শেষদিন একদিন পর। দাদার বাবা টাকাটা পাঠিয়েছেন কিন্তু দাদার হাতে তখনো টাকাটা পোঁছে নি। দাদার মন খুবই খারাপ। মন খারাপ করে একদিন করতোয়া নদীর ধারে বসে খূব কাঁদছিলেন। হঠাৎ এক হিন্দু বয়স্কা ভদ্রমহিলার নজরে এলো তিনি কাঁদছেন। মহিলা তাঁর কাছে এসে বললেন – হ্যাঁ গো তুমি কাঁদছো কেন? দাদা তো মুখ খোলে না। যা হোক অনেক চাপাচাপির পর দাদা বললেন সব কথা। ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবলেন তারপর দাদাকে বললেন – চলো ওঠো আমার সাথে চলো। আমি ব্যবস্থা করে দেবো। দাদা যাবে না ভদ্র মহিলাও নাছোড়বান্দা অথচ কেউ কাওকে চেনে না এই প্রথম দেখা। অবশেষে দাদা বাধ্য হলো তাঁর সাথে যেতে। ভদ্রমহিলা তাঁর বাসায় নিয়ে এলেন । দাদাকে খেতে দিলেন। তারপর একটা পুঁটলী হাতে করে দাদাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন একটা গয়নার দোকানে। সেখানে তাঁর গয়না বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে দাদার হাতে দিয়ে বললেন - এই টাকাটা দিয়ে তোমার পরীক্ষার ফি দিয়ে দাও তারপর তোমার টাকা এলে ফেরত দিয়ে দিও। তোমার লজ্জা সংকোচের কোন কারণ নেই।

এ টুকু বলতেই কবিতা বললো – দেখো এই হলো আমাদের হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক। এখানে ধর্ম নেই রাজনীতি নেই। আছে ভালবাসা মায়া আর মমতা।

আমি বললাম কবিতা তোমাকে এবার আমি একটা গল্প বলি। তুমি তো জানো লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী তোমাদের শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন এবং পরবর্তীতে সেখানে শিক্ষকতাও করেছেন। হিন্দি সংস্কৃত আরবী ফারসীসহ সর্বমোট ১৫টি ভাষায় তিনি অনর্গল বলতে পারতেন। একদিন সৌম্য চেহারার সুদর্শন সৈয়দ মুজতবা আলী গঙ্গার ধারে পায়চারী করছেন এমন সময়ে এক হিন্দু মহিলা সাথে আট-দশ বছরের একটি মেয়েকে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁর কাছে ছুটে এলেন। বললেন – বাবা বাড়িতে সরস্বতী পুজোর সব আয়োজন শেষ অথচ পুরোহিত এখনো এলো না। কোন পুরোহিত আর পাচ্ছি নে এদিকে আমার এ নাতনীটা পুজো না দিয়ে তার উপোস ছাড়বে না। ওদিকে বেলা পড়ে এলো। চল না বাবা। মহিলা সৈয়দ মুজতবা আলীকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বলতেই থাকলেন তুমি না গেলে আমার এ নাতনীটার কি হবে। সৈয়দ মুজতবা আলীর চোখ পড়লো কচি মেয়েটার শুষ্ক মুখের দিকে। তাঁর খুব খারাপ লাগলো। একটু ভাবলেন তারপর বললেন - চলুন। মহিলার বাড়ীতে গিয়ে সোজা পুরোহিতের আসনে বসে পড়লেন তিনি। বিশুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃত মন্ত্র পড়ে দিলেন। পুজোর যা করণীয় সবই

করলেন । এমন কি দক্ষিণাও নিলেন। বাড়ীশুদ্ধ লোক পুরোহিতের কাজে মহাখুশী। পুরোহিত সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলেন। পরবর্তী কালে স্বীকারোক্তিতে তিনি বলেছেন, - জানিনা মা সরস্বতী এই বিধর্মীর পুজোয় অসন্তুষ্ট হলেন কিনা? তবে আশা করি তিনি উপোসী বাচ্চাটির শুকনো মুখের দিকে চেয়ে এই অধমকে ক্ষমা করবেন।

ভাবছি প্রতি বছর প্রতিমা ভাংচুর পূজা মন্ডপ তছনছ এমন ঘটনা কি ঘটতেই থাকবে? কোন একটা বছর মনে করতে পারছি না যে বছর এমন ঘটনা ঘটেনি বা এমন সংবাদ শুনিনি পড়িনি। সেই পাকিস্তান আমলেও এমনটি ছিলো - এখনো আছে। কী মুসলিম লীগের আমল, কী আওয়ামী লীগের আমল কী এরশাদের আমল কী বিএনপি-জামায়াতের আমল। সব আমলেই প্রতিমা ভাংচুর হবে এবং যারা ভাঙ্গে তাদের নাম হয়ে যায় "দুর্বৃত্ত"। সব সরকারই এ ব্যপারে আঙ্গুলটা উঁচিয়ে দেবে বিরোধী দলের প্রতি। ওরা ওদেরই দুর্বৃত্ত। মাঝে মাঝে ভাবি "দুর্বৃত্ত"রা দেখতে কেমন? ওরা কী মানুষের মত নাকি অসূরের মত? এভাবে আর কতকাল?

এবারে যা ঘটেছে তার দায় সরকার এড়াতে পারে না। কুমিল্লার ঘটনার পর সারা দেশের পূজা মন্ডপে এবং হিন্দু অধুষ্যিত এলাকায় কি তেমন নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিলো? কেন সাতজন এসপিকে তৎক্ষনাত বদলী করতে হলো? ওরা কী সর্ষের ভূত? কেন ছাত্রলীগের কর্মীদের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেল? বিরোধীরা রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে গিয়ে রাজনৈতিক গেম খেলেছে। সরকার ভাল করেছে ওদের পাতা ফাঁদে পা দেয়নি কিন্তু সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দেয়া তো রাজনৈতিক ফরজ। সেখানে কেন গাফলতি হলো।

আমাদের সৌহার্দ্য ভালবাসা বন্ধন প্রতীতি নষ্ট করছে নিঠুর রাজনীতি - ধিক সেই রাজনীতিকে। আসুন আমরা সবাই হাতে হাত ধরে গোল হয়ে বসি রাজনৈতিক পরিচয় আস্থা বিশ্বাস পিছনে ফেলে – পাহারা দেই যেন আমাদের সম্প্রীতিতে রাজনীতি ঢুকতে না পারে। আমাদের ভালবাসা হোক সা'দত আলী আখন্দের পরীক্ষার ফি দেয়ার ভালবাসা – সৈয়দ মুজতবা আলীর সরস্বতী পূজার ভালবাসা।